



প্রথম আলো বিশেষ সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক অজয়রায়

সুশীল সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারে

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়ের জন্ম দিনাজপুর শহরে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পরিবারে, পারিবারিক সূত্রানুযায়ী বাংলা ১৩৪২ সনের ২৮ ফাল্গুন। দিনাজপুরেই স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা। এরপর ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে এমএসসি করার পর যোগ দেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। ১৯৬৭ সালে সেখানেই করেন পোস্ট ডক্টরেট। ১৯৬৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আবার যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কমিটি'র নির্বাহী পরিষদের সদস্য। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, সিটিজেনস ভয়েসসহ বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাহীদ রেজা নূর

প্রথম আলো : দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত (নভেম্বর-২০০১) 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কমিটি'র সদস্য আপনি। সংখ্যালঘু নির্যাতন ওই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

অধ্যাপক অজয় রায় : আমাদের দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বেড়ে গেছে। ২০০১ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপকভাবে নির্যাতন হয়, বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সাতক্ষীরা পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে। এটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সংগঠনেরও একই অভিজ্ঞতা। আমরা ভেবেছিলাম, এটি সাময়িক উত্তেজনার কারণে বেড়েছে, স্তিমিত হয়ে যাবে। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের দল এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবেন এবং এটি বন্ধ করার জন্য একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, যারা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছেন, তারা একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলেন না। যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, যারা পেশিশক্তিকে

ব্যবহার করার পক্ষপাতী, তারা এক ধরনের প্রশ্রয় পেল। এরা প্রশ্রয় পেয়েছে প্রশাসন থেকে, সাম্প্রদায়িক দলগুলো থেকে, যে জোট ক্ষমতায় এল, তাদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে। আমি বলতে চাইছি, দলের ক্ষমতাসীন দলগুলোর যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তারা তাদের স্থানীয় দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়নি, তাদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে নির্যাতন বন্ধ করা যায়নি, যা মাঝে মধ্যে এখনো চলছে। প্রশাসনের নিচুস্তরের লোকদের সঙ্গে অর্থাৎ থানা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে কথা বলে দেখেছি, প্রশাসনে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এটা দমন করতে চান, কিন্তু অনেক সময় রাজনৈতিক সবুজ সংকেতের কারণেই তা পারেন না বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, প্রশাসন যেন অনেকটা সূধীনভাবে কাজ করার মনোবৃত্তিটা হারিয়ে ফেলেছে। সবসময়ই ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

প্রথম আলো : *যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আপনি তো তাদের অনেকের কাছেই গেছেন। তাদের কথা একটু বলবেন?*

অধ্যাপক অজয় রায় : অভিজ্ঞতা নানা ধরনের। সেটা বলার আগে আমি একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলে নিই। আমরা সাধারণত দাঙ্গা যেগুলোকে বলি, সেগুলো থেকে এবারের ঘটনার চরিত্রগত একটা পার্থক্য আছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বা নব্বইয়ের দশকে যেগুলোকে দাঙ্গা বলতাম, সেগুলো যাদের ধন-সম্পদ আছে, ব্যবসা আছে, তাদের ওপরে হয়েছে। অর্থাৎ একটা উদ্দেশ্য ছিল, এদের যদি নির্যাতন করি তাহলে তার সম্পত্তি গ্রাস করতে পারি, যিনি ব্যবসায়ী, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করতে পারি, যিনি সফল আইনজ্ঞ, তার ক্ষেত্রটা দখল করতে পারি। এবারে যা ঘটল, তা দাঙ্গা নয়। এটা একতরফের ঘটনা। মারামারি হয়নি, শুধু মারা হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় এবার অত্যন্ত নিরীহ, গরিব সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক বেশি নিপীড়িত হয়েছে। এদের কিছুই নেই। অনেক গ্রামে গিয়ে দেখেছি, নির্যাতিতরা ক্ষেতমজুর, ছোটখাটো দোকানপাট চালায়, পরের জমিতে হালচাষ করে, তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সামান্য সম্পদও লুট করা হয়েছে, তাদের মেয়েদের ইজ্জত হরণ করা হয়েছে-স্বল্প বয়সের কিশোরী, গর্ভবতী পুত্রবধূ, বৃদ্ধা এই নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়েছে। প্রশ্নের জবাবে অসহায়ের মতো চেয়ে থেকেছে-বলেছে, তারা সংখ্যালঘু, অন্যধর্মী-এই তাদের অপরাধ। ধরে নেওয়া হয়েছে, তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে অথচ তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি। এদের সঙ্গে যখন কথা বলেছি, তখন এদের কেউই বলেনি যে, দেশ ছেড়ে যাব। শুধু চেয়েছে প্রধানমন্ত্রী যেন এ দেশে শান্তিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন, তারা আর ভোটের হতে চায় না, ভারতবর্ষ কোথায়- তাও তারা জানে না। অনেক সময় দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। প্ররোচিত করা হয়েছে। তুমি যদি না যাও, তাহলে অত্যাচার করা হবে। চাঁদাবাজি হয়েছে, বাড়িঘর লুণ্ঠন হয়েছে, এটা আপনারা জানেন।

প্রথম আলো : অনেকের মধ্যেই এখন এ রকম একটি ধারণা গড়ে উঠছে যে, এ দেশে তো শুধু সংখ্যালঘুদের ওপর নয়, সব সম্প্রদায়ের ওপরই নির্যাতন চলছে।

অধ্যাপক অজয় রায় : এগুলোকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করতে হবে। নির্বাচন-পরবর্তীকালে যে নৃশংস ঘটনা ঘটল, সেখানে দুই শ্রেণীর মানুষ নিপীড়িত হয়েছে। যে রাজনৈতিক জোট ক্ষমতায় এসেছে, তাদের যারা বিরোধী, সেসব দলের সমর্থকদের, নেতাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন হয়েছে। সেটা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হয়েছে, তখন তা হয়েছে নির্বিচারে। সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে ৪০-৪১ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে জোটবিরোধী দলগুলোকে, সে হিসাবে মুসলমানদের ওপরই নির্যাতন বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয়নি। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন হয়েছে বেছে বেছে, যারা প্রভাবশালী তাদের ওপর, স্থানীয় নেতাদের ওপর। কিন্তু ধর্মীয় বা এথনিক সংখ্যালঘুদের ওপর তা চলেছে নির্বিচারে; তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি তুমি কোন দল করো। ঢালাওভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক। এটা সত্য যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ওপরও নির্যাতন চলেছে, সেসব জায়গাতেও আমরা গেছি। কিন্তু আনুপাতিক হারে সেটা অনেক কম। সেজন্য আমার মনে হয়েছে এ নির্যাতনের পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বিষ্টতা কার্যকর ছিল।

প্রথম আলো : কী উদ্দেশ্যে এ ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছে বা এখনো হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়, শুধুই কি সম্পত্তি গ্রাস?

অধ্যাপক অজয় রায় : না, শুধু সম্পত্তি গ্রাসই লক্ষ্য নয়। তাহলে অত্যাচার-নিপীড়ন সম্পদশালী সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের ওপর সীমাবদ্ধ থাকত। এবারকার অত্যাচার-নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু ছিল সাধারণ মানুষ। একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও অন্তর্নিহিত রয়েছে এ ধরনের কার্যাবলির পশ্চাতে। জোটবদ্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তার অধিষ্ঠানকে চিরস্থায়ী করতে চায়। এরা জানে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ১৯৪৭ সালের পর থেকে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সেক্যুলার ও উদারমনা গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে এবং এই শক্তিটি পশ্চাত্মুখী সাম্প্রদায়িক শক্তি বনাম উদারমনা গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বন্দ্বে ব্যালান্স অব পাওয়ার হিসেবে ত্রিভুজাঙ্গী। সুতরাং ক্ষমতার সমতা বিধানকারী এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শক্তিটিকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্জীব ও অকার্যকর করে দিতে পারলে, সামগ্রিক জাতীয় জীবন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে সাম্প্রদায়িক শক্তিটির পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সহজতর হবে। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাস, অত্যাচার-নির্যাতন, দেশ থেকে বিতাড়ন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্যোগ ও সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের

মডেলে ‘ধর্ম অবমাননা’ (ব্লাসফেমি ‘ল’) আইন প্রয়োগের পায়তারা ইত্যাদি এই রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্যই পরিচালিত। সাম্প্রদায়িক শক্তিটি ক্রমশ এ দেশটিকে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত একটি একাশীয়া ও একধাতব (মোনোলিথিক অ্যান্ড মোনোমেটালিক) ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে রত- ‘আহমদিয়া’ নামে পরিচিত একটি সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নামে ঘোষণার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি তার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

প্রথম আলো : *যেভাবে সারা দেশে নারী নির্যাতন ঘটেছে নির্বাচনের পর, বাংলাদেশের ইতিহাসে কি এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে? আমি একাত্তরের সেই বর্বরতাকে এখানে আনছি না।*

অধ্যাপক অজয় রায় : এটি অস্বীকার করার উপায় নেই, সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতনের ঘটনা তাৎপর্যময় হারে বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও মৌলবাদীদের উত্থান প্রভৃতি এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। নারীরা সব সময়ই আমাদের সমাজে নির্যাতিত হয়ে আসছে এবং ক্রমশ বাড়ছে। এ ছাড়া রয়েছে যৌতুকের কারণ, ফতোয়াবাজির কারণ। এখন নারী নির্যাতনটা গণহারে হচ্ছে। আমরা ইংরেজিতে বলি- এনম্যাস; ধর্ষণের কথাই যদি বলেন, এখন একটা নতুন শব্দ চালু হয়েছে, গণধর্ষণ। এটাও নির্বিচারে হয়েছে এবং হচ্ছে। একই নারী বারবার অত্যাচারিত হচ্ছে। শুধু আমাদের সমাজে নয়, বার্মায়, পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানে তো বটেই। নারীদের কোনো অধিকারই নেই সেখানে। আমার আর একটি দিক মনে হয়, যতই নারীরা ক্ষমতায়নের জন্য, তাদের সম অধিকার আদায়ের জন্য লড়ছে তাদের ওপর যেন ততই সামাজিক অত্যাচার বাড়ছে-সরকার বা রাষ্ট্রশক্তি তাদের রক্ষা করতে পারছে না। আমার দৃষ্টিতে আর একটি বিষয় ধরা পড়েছে, যেসব দেশে উগ্র মৌলবাদী শক্তি দৃঢ়, সেখানেই নারীরা অধিকতর হারে নির্যাতিত হয়। যেমন- আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ইত্যাদি। মনে হয় যেন মৌলবাদের সঙ্গে নারী অধিকার হরণ ও নির্যাতন সরাসরি সহসম্পর্কিত।

প্রথম আলো : *যারা এটা করছে, তারাও তো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলেরই কর্মী বা ক্যাডার। যারা এই ক্যাডারদের লালন-পালন করছেন, তিনি জেনেশুনে তার লোকজনকে এ রকম অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন? তাহলে মূল্যবোধটা আর থাকল কোথায়? গণধর্ষণ হচ্ছে, কিন্তু কারো মনে তা রেখাপাত করছে না? শুভবুদ্ধির উত্থান হচ্ছে না কেন?*

অধ্যাপক অজয় রায় : যখন একই ধরনের ঘটনা অনবরত হতে থাকে, তখন সমাজে একটা গা-সওয়া ভাব এসে যায়। এর কারণ দুটো। যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা যদি আন্তরিক না হন, এই মূল্যবোধে যদি তারা বিশ্বাসী না হন, তাহলে এটি তো প্রশ্রয়

পাবেই। আমি মনে করি না যে, সরকার বা প্রশাসনের সদিচ্ছা নেই। অবশ্যই আছে। যারা সরকার পরিচালনা করছেন বা প্রশাসনে আছেন, এদের সদিচ্ছা নেই, তা আমি বলব না। এগুলো তো তাদের ইমেজকেই নষ্ট করছে। আমার মনে হচ্ছে, এই যে একটা নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে, এটা তারই ফল। অর্থাৎ আমার যদি পেশিশক্তি থাকে, তাহলেই আমি রাজনৈতিক অঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজকে নিয়ন্ত্রণ করব, সব সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করব পেশিশক্তি দিয়ে। সরকার বলুন, অন্য রাজনৈতিক দলগুলো বলুন, আমরা সবাই মাস্তানিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। সদিচ্ছা থাকলেও আমাদের ক্ষমতা নেই এদের নিয়ন্ত্রণ করার। এই পেশিশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করা না গেলেও যদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে অসৎ বা পেশিশক্তিনির্ভর রাজনৈতিক দলসমূহ বা ব্যক্তিবর্গের অবস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলো হয়তো বেরিয়ে আসবে। আমার মনে হয়, এই আশঙ্কা থেকেই তারা মুখে যতই বলেন সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়তে চান, সেটা আসলে তারা বলেন, তারা চান অন্যদের হাতে সন্ত্রাসী থাকবে না, আমার হাতে থাকবে। আমি যেন ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এদের কাছ থেকেই নিচুস্তরের মাস্তানরা প্রশ্রয় পেয়েছে, বলদীপ্ত হয়েছে এবং তারা জানে যে, আমি যদি খারাপ কাজ করি, তাহলে আমাকে আইন স্পর্শ করতে পারবে না।

প্রথম আলো : *আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কী অবস্থা বলে মনে করেন?*

অধ্যাপক অজয় রায় : এটি বড় শক্ত প্রশ্ন। আমি সাধারণ মানুষকে কোনো সময়ই দোষারোপ করি না। আমি যেখানেই গেছি, নির্ভয়েই গেছি। আমার ওপরে শারীরিকভাবে কোনো হামলা হয়নি। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পেয়েছি। যখন একজন সংখ্যালঘু মানুষ নির্যাতিত হয়েছে বা তার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, তখন সব মানুষই বলেছে কাণ্ডটা খারাপ হয়েছে। তারা অসহায় মানুষ, তারা কিছু করতে পারেননি, এটা ঠিক। কিন্তু বলেছেন, কাজটি খারাপ হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি না যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি আছে। যারা রাজনৈতিকভাবে মোটিভেটেড, তাদের মধ্যে আছে সত্যি। কথা হলো, এই সাধারণ মানুষকে তো উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যখন আক্রমণ হয়, তখন সাধারণ মানুষ যেন তা ঠেকাতে পারে, সে ধরনের কাজগুলো যাদের করা উচিত তারা সেটা করতে পারেনি।

প্রথম আলো : *কাদের কথা বলছেন?*

অধ্যাপক অজয় রায় : সিভিল সোসাইটি তো বটেই, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ-ব্যক্তিগতভাবে এবং তার দল ইত্যাদি। এদের যতটা কার্যকর ভূমিকা থাকা দরকার, তা ছিল না। এটা হচ্ছে আমাদের বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি। আমরা উদার অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে আহ্বান করেছি, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বলেছি, তারা

মানববন্ধন করেছেন, ঘটনাবলির ধিক্কার দিয়েছেন- সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নির্যাতনের পাশে দাঁড়াতে হবে কার্যকরভাবে। বলতে হবে, আমরা তোমাদের পাশে আছি পার্থিবভাবে যতদিন অবস্থা শান্ত না হয়, স্থানীয়ভাবে সভা-সমিতি-মিছিল করব। এটি করা হয়নি। আগে কিন্তু এটি হতো।

প্রথম আলো : *মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।*

অধ্যাপক অজয় রায় : আমি মনে করি, এটি মানবাধিকারের প্রথম শ্রেণীর লঙ্ঘন। পুলিশ হচ্ছে রক্ষক। কিন্তু কথা বা তথ্য আদায়ের জন্য তারা যেসব অমানবিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, সেগুলোকে আমি গ্রহণযোগ্য মনে করি না। অনেক তথাকথিত সভ্য দেশেও এ ধরনের পদ্ধতি বিদ্যমান, যার আমি নিন্দা করি। যে মুহূর্তে ব্যক্তিটি আদালতে সোপর্দ হন, বলেন যে আমার ওপর পুলিশ অত্যাচার চালিয়ে জোর করে এই সীকারোক্তি আদায় করেছে। আদালতের কাছে এই সীকারোক্তির কোনো মূল্যও থাকে না। প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিত, যেন কোনো ব্যক্তির ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো না হয়। এমন কোনো ধরনের মানসিক নির্যাতনও যেন চালানো না হয়, যাতে ভবিষ্যতে তার মনের ওপর চাপ পড়ে মনোবিকৃতি ঘটতে পারে। আমার মনে হয়, পুলিশ প্রশাসনের উচিত পরিশীলিত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, কথা বা তথ্য আহরণের লক্ষ্যে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়বে না-ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন হবে না।

প্রথম আলো : *সরকার ও বড় রাজনৈতিক দলগুলো কি চাইলেই এই সাম্প্রদায়িক হামলা, সাংবাদিক নির্যাতন ইত্যাদি বন্ধ করতে পারে, নাকি এগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে?*

অধ্যাপক অজয় রায় : প্রধানত সেটা পারে সরকার বা যে দলটি বা দলগুলো সরকারে আছে, তারা। তাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে সর্বাগ্রে। তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা দেশে সুশাসন চায়। এই সদিচ্ছাটা তো দেখাতে হবে। সুরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হয়াত-মউত আল্লাহর হাতে। এই যদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে পুলিশ বলবে যে, আমাদের তো গিয়ে লাভ নেই, তার দিন শেষ হয়ে গেছে, চলে গেছে। সুশীল সমাজের অনেকগুলো সংগঠন আছে, তারা যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে, বিরোধী দলগুলোও যদি কার্যক্ষেত্রে নামে, তাহলে এই অশুভ শক্তিকে আমরা পরাজিত করতে পারব। আমি নিজে আশাবাদী মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়, তারা হানাহানি চায় না, নারী নির্যাতন চায় না। কোনো ইস্যু এলে তাদের সাম্প্রদায়িক হতে ইন্ধন জোগানো হয়।

প্রথম আলো : আর একটা বিষয়। স্বাধীন বঙ্গভূমি ধরনের আন্দোলনগুলোও কি সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয় না?

অধ্যাপক অজয় রায় : আমি মনে করি, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন একটি তুচ্ছ-বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। আমাদের বাংলাদেশে এই আন্দোলন কোনো রেখাপাত করেনি। আমার মনে হয় না, পশ্চিমবঙ্গেও তেমন কোনো ভিত্তি আছে এদের। এটি একটা প্রায় মৃত সংগঠন। এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন এটা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হয়েছিল। মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো সেটা করা হয়েছিল। বঙ্গভূমি আন্দোলনের প্রতি কোনো নৈতিক সমর্থনও দেওয়ার কিছু নেই।

প্রথম আলো : ভারতে এখন বিজেপি ক্ষমতায়, পাকিস্তানেও ধর্মীয় রাজনীতি এগিয়েছে। আমাদের এই উপমহাদেশে কি জাতিভিত্তিক রাজনীতির জায়গায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিকাশমান হচ্ছে?

অধ্যাপক অজয় রায় : দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পরাজয় ঘটেছে বলে আমি মনে করি। অন্তত পশ্চাদপসারণ করেছে। পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির অবস্থা এ উপমহাদেশে সবচেয়ে খারাপ। ভারতবর্ষেও একটি দল ক্ষমতায় আছে, যার রাজনৈতিক দর্শন হলো উগ্র হিন্দুত্ববাদ। ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এখনো প্রবল।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক অজয় রায় : আপনাকেও ধন্যবাদ।

উৎস : <http://www.prothom-alo.net/newhtmlnews1/category.php?CategoryID=3&Date=2004-02-15>

সংকলন : মুক্ত-মনা (<http://www.mukto-mona.com>) : Friday, February 20, 2004